অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকের সুরক্ষা ও উন্নয়ন

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ
মোঃ আওরঙ্গজেব আকন্দ

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বিগত কয়েক দশকে উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। একইভাবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির পরিমাণ ৫৬.৭ মিলিয়ন, যার মধ্যে ৪৭.৩ মিলিয়ন শ্রমশক্তিই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত আছে; শতকরা হিসেবে যা মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৮ শতাংশ। অপরদিকে বাংলাদেশে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার বৃহদাংশই এই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১০ অনুযায়ী, বাংলাদেশের নারী শ্রমিকের সংখ্যা ১৭.২ মিলিয়ন, যা মোট শ্রমশক্তির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। নারী শ্রমিকদের বৃহদাংশই (৮৬.৬২ শতাংশ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ২০০০ থেকে ২০১০ সালের ব্যবধানে জাতীয় পর্যায়ে, গ্রাম এবং শহর অঞ্চলের শ্রমবাজারে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ যথাক্রমে ১০.০০ শতাংশ, ১০.৬৩ শতাংশ এবং ৪.১৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে (রহমান ২০১৩)।

পরিসংখ্যান থেকে আরো দেখা যায় যে, সার্বিকভাবে গত দুই দশকে বাংলাদেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা (১৫+ বছর) ২০০৩ সালের ৩ কোটি ৫১ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে ৪ কোটি ৭৩ লাখ হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই বৃদ্ধির হার পূর্বের তুলনায় ত্বরিত গতিতে ঘটছে। বাংলাদেশের শ্রমবাজারে পুরুষ শ্রমিক অপেক্ষা নারী শ্রমিকের বৃদ্ধি দ্রুততর। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ২০০০ সালের ২ কোটি ২৭ লাখ পুরুষ শ্রমিক ৪.২৭ শতাংশ হারে বার্ষিক বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে ৩ কোটি ২৪ লাখে উন্নীত হয়েছে, যেখানে নারী কর্মীর সংখ্যা বার্ষিক ১২.৫৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে ৬৬ লাখ থেকে ২০১০ সালে ১ কোটি ৪৯ লাখে বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমশক্তিতে নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ একদিকে যেমন দারিদ্র্যের হার কমাতে অবদান রাখছে, তেমনি বেকারত্ব ও পরনির্ভশীলতার হারও কমে আসছে। একইসাথে এটি দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিও নিয়ন্ত্রণ করছে, যা জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এবং বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১-এর মতো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়নের প্রধান শর্ত।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সাধারণত ক্ষুদ্র-পরিসীমায় পরিচালিত। স্বনিযুক্ত কার্যক্রম, যা সাময়িক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং উপার্জনের জন্য নিম্নস্তরের কাঠামো ও প্রযুক্তিবিহীন বা নিম্ন ধরনের প্রযুক্তি দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান নিয়ে এ খাত গঠিত। কার্যক্রমসমূহ সাধারণত কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি বা অনুমোদন ছাড়াই পরিচালিত হয় এবং প্রশাসনিক নিয়মনীতির প্রয়োগ এ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না।

বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান আইন বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ শ্রমিকের মানসম্মত মজুরি নির্ধারণ, কর্মঘণ্টা, ছুটি, বিশ্রাম, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা এবং কল্যাণ কার্যক্রমের বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের এ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সংজ্ঞায়িত করার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাও আইনে দেয়া হয় নি। এর ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকেরা ব্যাপকভাবে অধিকারহরণ ও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এ খাতের শ্রমিকেরা স্বল্প উৎপাদনশীলতার নিম্ন মজুরিসম্পন্ন কাজে নিয়োজিত হচ্ছে, যার কর্মপরিবেশ প্রায়শই ঝুঁকিপূর্ণ এবং যা নিম্নমানের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাসম্পন্ন। নিশ্চিত কাজ, লিখিত নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র, নিরাপদ জীবিকা, সুনির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, ছুটি ও বিশ্রাম এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির মতো মৌলিক শ্রমিক অধিকার থেকে শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছেন। লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার এ খাতের নারী শ্রমিকদের অবস্থা এ ক্ষেত্রে আরো শোচনীয়। কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকেরা প্রায়ই বিভিন্ন ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। মানসম্মত জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কাঠামোর অনুপস্থিতি, প্রয়োজনীয় সামাজিক নিরাপত্তার অনুপস্থিতি, কর্মখাত অনুযায়ী মজুরি প্রদানে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং শ্রম আইন ও শ্রমনীতির সঠিক প্রয়োগের অভাবে অধিকাংশ নারী শ্রমিকই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। তুলনামূলকভাবে নারী শ্রমিকদের স্বল্প দক্ষতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে অদক্ষতা কর্মক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন করেছে। উপরন্তু, সংগঠিত হওয়া তথা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার না থাকা তাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে আরো নাজুকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও তাদের অধিকার এবং নিরাপত্তার প্রশ্নটি উপেক্ষা করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ, কর্মক্ষেত্রে যথাযথ মর্যাদা, প্রাপ্য অধিকার এবং মানসম্মত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে না পারলে জাতীয় পর্যায়ের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন সম্ভব হবে না।

নারী শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষায় জাতীয় আইন কাঠামো

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব

বাংলাদেশের সকল নাগরিকের অধিকার ও সকল আইনের উৎস হচ্ছে সংবিধান। এই সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষ সমতা ও সমঅধিকারের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, যা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র বাধ্য। সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। এ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের কর্মের অধিকার, যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার; যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার এবং ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রতিকূল অবস্থায় সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও, ১৯(১) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রকে দায়িত্বপূর্ণ করা হয়েছে। ২৮(২) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের সকল স্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভের বিষয়টি

নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্টভাবে শ্রমজীবী মানুষকে সকল প্রকার শোষণ ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে এবং অনুচ্ছেদ ২০-এ কাজকে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ও সম্মানের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রম আইন

সাধারণত, কোনো দেশের শ্রম আইন শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষার প্রধান হাতিয়ার। বাংলাদেশে শ্রমিক অধিকার বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ দ্বারা নিশ্চিত করার বিধান করা হয়েছে। শ্রমিক নিয়োগ, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক, সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণ, মজুরি পরিশোধ, কার্যকালে দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকের জখমের জন্যে ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, শিল্প বিরোধ উত্থাপন ও নিষ্পত্তি, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও চাকুরির অবস্থা ও পরিবেশ এবং শিক্ষাধীনতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সকল আইনের সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে ২০১৩ সালে আইনে কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে, যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী 'শ্রমিক' অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোনো ব্যক্তি, তাহার চাকুরির শর্তাবলি প্রকাশ্য বা উহ্য যেভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোনো ঠিকাদার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এর মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোনো দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানিগিরির কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রধানত প্রশাসনিক, তদারকি কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না [ধারা ২ (৬৫)]।

বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের একটি বৃহৎ অংশ এই সংজ্ঞা অনুযায়ী আইনগতভাবে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকগণ আইনি সুরক্ষার বাইরে রয়েছেন। আইনগতভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের স্বীকৃতি না থাকায় এ খাতের শ্রমিকেরা সংগঠিত হওয়া, যৌথ দরকষাকষির সুযোগ, লিখিত নিয়োগপত্র, শোভন কর্মঘণ্টা, ওভারটাইম ভাতা, সাপ্তাহিক ছুটি, বিশ্রাম, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা, প্রসূতি কল্যাণ, মানসম্মত নিম্নতম মজুরির মতো অন্যান্য মৌলিক শ্রমিক অধিকার ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের অধিকাংশই (৮৭.৫ শতাংশ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত।

জাতীয় শ্রমনীতি

বাংলাদেশের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণ রক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে শোভন কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রণীত জাতীয় শ্রমনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। শ্রমনীতির শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মস্থল ও পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ নীতির আলোকে শ্রমজীবী মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ ও জীবনধারণ উপযোগী ন্যূনতম মজুরির মানদণ্ড নির্ধারণ ও দ্রব্যমূল্যের সাথে সংগতি রেখে নিয়মিতভাবে মজুরি পর্যালোচনা ও পুনঃনির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা আছে। এ ছাড়াও, অবসর, বেকারত্ব, পেশাগত দুর্ঘটনাজনিত কারণে কর্মহীনতা, স্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারানো ইত্যাদি সমস্যা মোকাবেলার জন্য পৃথক সামাজিক বিমাব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে শ্রমিক ও তার পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া রয়েছে।

শ্রমনীতিতে নারী শ্রমিকদের বিষয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ শ্রমনীতির একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এ নীতিতে নারী শ্রমিকের জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত, নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতের পাশাপাশি মাতৃত্ব সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬ প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬-এর ধারা ২(ক)-এ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— 'অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত' অর্থ এইরূপ বেসরকারি খাত যেখানে কর্মরত শ্রমিকের কাজের বা চাকুরির শর্ত, ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নহে এবং যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬ অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬-এর ধারা ৫ অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যাবলি হবে, শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন; কল্যাণার্থে বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; শ্রমিকদের বিশেষত অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান; অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক সাহায্য প্রদান; দুর্ঘটনায় কোনো শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান; শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান; শ্রমিকদের জীবনবিমাকরণের জন্য বিমাব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এই লক্ষ্যে তহবিল থেকে সংশ্লিষ্ট বিমাপ্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করা।

নারী শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক আইন কাঠামো

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ ও জারি করে। এই ঘোষণায় বর্ণিত অধিকার নারী ও পুরুষভেদে সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ-এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সনদ নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ করে। বাংলাদেশের সংবিধানেও তার প্রতিফলন রয়েছে। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৩, ২০ ও ২৩ ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকেরই জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে (ধারা ৩), প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হওয়ার অধিকার রয়েছে (ধারা ২০) এবং প্রত্যেকেরই কোনো বৈষম্য ব্যতিরেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে, প্রত্যেক কর্মীর তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক এবং প্রয়োজনবোধে সেই সঙ্গে সামাজিক সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থাদি সংযোজিত লাভের অধিকার রয়েছে (ধারা ২৩)।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে সংস্থার ৮টি মূল কনভেনশনের মধ্যে ৭টি কোর কনভেনশনসহ ৩৩টি কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করেছে। আইএলও কনভেনশনে সুনির্দিষ্টভাবে নারী শ্রমিকের অধিকারসংক্রান্ত বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা হোমওয়ার্ক কনভেনশন ১৭৭-এ গৃহশ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এ কনভেনশন অনুমোদনকারী প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র গৃহকর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঝে মাঝে নিয়োগকর্তা ও কর্মীদের প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থাসমূহের সাথে পরামর্শক্রমে জাতীয় নীতিমালা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর পর্যালোচনা ও পুনর্বিন্যাস করবে (অনুচ্ছেদ ৩)। এ কনভেনশনে স্বেচ্ছায় গৃহকর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠা বা কোনো সংস্থায় যোগদান এবং এই ধরনের সংস্থার কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার, চাকুরি বা পেশার বৈষম্য থেকে রক্ষার অধিকার, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত ও স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা রক্ষার অধিকার, পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার, সংবিধিবদ্ধ সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষার অধিকার, প্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার, কর্মে বা চাকুরিতে প্রবেশের নিম্নতম বয়সসীমা, মাতৃত্ব রক্ষার অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক নারী অধিকার রক্ষায় প্রণীত সিডও সনদ ও বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন-এ স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ হাইকোর্ট ২০০৯ সালে সিডও সনদের আলোকে কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাঙ্গনে নারী ও শিশুর প্রতি যৌন হয়রানি বন্ধে একগুচ্ছ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা

নারী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশের বিভিন্ন আইন ও নীতিমালায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬-এ শ্রমিকের আইনগত সমঅধিকার, ন্যায়বিচার, শোভন জীবনযাপনের মান নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তাবিধান করার মতো সর্বজনীন মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দিকনির্দেশনা ও বিধান রয়েছে। কিন্তু শ্রমিক অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের প্রধান আইন, বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬-এ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে আইনি সুরক্ষার বাইরে রাখায় নারী শ্রমিকদের বৃহৎ অংশ, যাঁরা সাধারণত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতেই কর্মরত তারা আইনি সুরক্ষা ও মৌলিক শ্রম অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিশেষভাবে নারী শ্রমিকদের প্রতি লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, লিঙ্গভেদে সমকাজের সমমজুরি, শারীরিক ও যৌন হয়রানি বন্ধ, মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিত, কর্মস্থলে শিশুর যত্ন নিশ্চিত, আইনগতভাবে স্বীকৃত কর্মঘণ্টা অনুসরণ ও অতিরিক্ত কাজের জন্য ওভারটাইম ভাতা সুবিধা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ক্ষতিপূরণ আদায়, মালিক-শ্রমিক পেশাগত সম্পর্ক নির্ণয় ও সংগঠন করা বা সংগঠনে যোগদানের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে জাতীয় শ্রম আইনের আওতায় আনা আবশ্যক ও সময়ের দাবি। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে আইনি সুরক্ষার বাইরে রেখে নারী শ্রমিকদের অধিকার ও জীবনমান উন্নয়ন যেমন সম্ভব নয়, তেমনি আন্তর্জাতিক শ্রমমান নিশ্চিত করাও অসম্ভব।

নারী শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত এবং সুরক্ষার পাশাপাশি শ্রমের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে আইন একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। শ্রম আইনে বিভিন্ন অধিকার বিষয়ে কথা বলা হয়েছে, যা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক। প্রধান ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো :

সংগঠিত হওয়া এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বর্তমানে কেবল প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকেরাই আইনগতভাবে সংগঠন করার সুযোগ পায়। ফলস্বরূপ, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক খাতের একটি অংশ যাঁরা শ্রমিক হিসেবে আইনগতভাবে স্বীকৃত নন, যেমন শিক্ষক, সরকারি চাকুরিজীবী, কৃষক, দিনমজুর এবং আরো অনেকেই আইনগতভাবে সংগঠন করার সুযোগ পান না।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো ন্যায়বিচার প্রাপ্তি ও আইনের দৃষ্টিতে সমতা, কিন্তু দেশের অধিকাংশ শ্রমিক এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মোট শ্রমিকের ৮৭.৫ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত এবং মাত্র ১২.৫ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত, যাঁরা ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য শ্রম আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন।

ন্যূনতম মজুরি

বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, সরকারি খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। আবার প্রাতিষ্ঠানিক খাতে যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে মজুরি নির্ধারণের সুযোগ রয়েছে এবং মজুরি বোর্ডের বিধান অনুযায়ী মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করারও সুযোগ রয়েছে। কিন্তু যেখানে জাতীয় মজুরি বোর্ড নেই, সেখানে মালিকরাই মজুরি নির্ধারণ এবং ইচ্ছামাফিক মজুরি প্রদান করে থাকে, যা শ্রমিদের যুক্তিসংগত ন্যায্য মজুরি পাওয়ার অন্তরায় হয় ও শোষিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিম্নমজুরি, নিম্নমানের কর্মপরিবেশ, শ্রমিকের মৌলিক অধিকারের সঠিক বাস্তবায়নের অভাব এবং বিভিন্ন অনিয়ম, যা সম্পূর্ণভাবে মানবাধিকারকে উপেক্ষা করে।

সামাজিক নিরাপত্তা

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড ও বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা শ্রমিকদের মানবাধিকার হিসেবে একটি স্বীকৃত বিষয়। বর্তমানে এটি কেবল সরকারি এবং করপোরেট শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। সার্বিকভাবে বেশির ভাগ শ্রমিকেরই সামাজিক নিরাপত্তার তেমন কোনো বিশেষ ব্যবস্থা লক্ষ করা যায় না; যেমন, চাকুরির নিরাপত্তা, পেনশন, ভবিষ্যৎ তহবিল, বিমা ইত্যাদি। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকেরা 'শ্রমিক' হিসেবেই স্বীকৃত নয়। ফলে, বেশির ভাগ শ্রমিকই মালিকপক্ষ থেকে সামাজিক নিরাপত্তা আদায়ে আইনগত অধিকারের আওতায় নেই। যদিও সাংবিধানিকভাবে সকল নাগরিক সামাজিক নিরাপত্তা পাওয়ার এখতিয়ারভুক্ত ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬ অনুযায়ী অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা স্কিম প্রণয়নের সুযোগ রয়েছে, তথাপি শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প গ্রহণ ও সুবিধা নিশ্চিতকরণে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তকরণের কোনো বিকল্প নেই।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তকরণের কারণসমূহ নিম্নে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হলো :

শ্রম আইনে শ্রমিকের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, সার্ভিস বুক এবং নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক ও পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সংজ্ঞায়িত করে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে এ খাতে কর্মরত শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্যভাবে নারী শ্রমিকদের শ্রমিক অধিকার রক্ষার আইনগত ভিত্তি ও বিশেষ উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

শ্রম আইনে মৌলিক মানবাধিকার, যেমন সংগঠন করার স্বাধীনতা, ন্যায়বিচারের অধিকার ও লিঙ্গভেদে কর্মে সমঅধিকার ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে, যা নারী শ্রমিকদের মানবাধিকার ও শ্রম অধিকার রক্ষায় অপরিহার্য।

শ্রম আইনে কর্মসংক্রান্ত বিভিন্ন মৌলিক নিয়ম, যেমন চাকুরির নিরাপত্তা, কর্মঘণ্টা, ছুটি ও বিশ্রাম, ওভারটাইম, মজুরি নির্ধারণের মানদণ্ড, পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা, জীবিকার নিরাপত্তা, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে বিধান ও দিকনির্দেশনা রয়েছে, যা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার জন্য আবশ্যক।

শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও কর্মস্থলে দুর্ঘটনাসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ আদায় শ্রম আইনে আলোচনা করা হয়েছে, যা এ খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সকল নারী শ্রমিকের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সুবিধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সুবিধা নিশ্চিতকরণে তাদের শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

শ্রম আইন ২৬৪, ২৩৪, ৯৯, ৪৬ এবং ১৫০ ধারা আঘাত, অক্ষমতা এবং কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে ক্ষতিপূরণের কথা আলোচনা করেছে, যা সকল শ্রমিকের জন্য অভিন্ন হওয়া উচিত। তাই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতটিও শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

প্রতিষ্ঠানভুক্ত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান বিষয়ে শ্রম আইনে আলোচনা করা হয়েছে। নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান ও শ্রমিক-মালিক শিল্প সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকের উন্নয়নে অনুসরণীয় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রধানত ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়া অঞ্চলের শ্রমবাজার অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতনির্ভর এবং অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের নারীদের কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হচ্ছে এই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক তথা নারী শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং নিরাপদ কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা এ খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে পথনির্দেশক দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

২০০৫ সালে কৃত ভারত সরকারের কর্মসংস্থান এবং বেকারত্বের ওপর পরিচালিত নমুনা জরিপ অনুসারে, ভারতের মোট শ্রমশক্তির ৯৩ শতাংশ এবং অকৃষি খাতের ৮২ শতাংশ শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মে নিয়োজিত। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জীবনমান, অক্ষমতা, স্বাস্থ্য এবং বয়স্কভাতা বিমার আওতাধীন করে ভারতের জাতীয় সংসদে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে 'অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিল' পাস করা হয়। এই আইনের অধীনে বিস্তৃতভাবে 'জাতীয় স্বাস্থ্যবিমা কর্মসূচি'-র আওতায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। ভারতে অসংগঠিত খাতের জন্য একটি জাতীয় কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় তহবিল এবং সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা

কার্যক্রম এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। বিল্ডিং এবং অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণার্থে পৃথক আইন রয়েছে। এ আইনের অধীনে গঠিত কমিশন প্রধানত তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে থাকে; শ্রমিকের ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ, জীবিকার উন্নয়ন।

আত্মনির্ভরশীল নারীদের সংগঠন (এসইডব্লিউএ)

আত্মনির্ভরশীল ও নিম্ন আয়ের নারীদের সংগঠন এসইডব্লিউএ নিজেদের শ্রম অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহকারী নারীদের দ্বারা গঠিত একটি ট্রেড ইউনিয়ন। এর প্রধান লক্ষ্য নারীদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, যেখানে কাজ ও আয়ের নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং সামাজিক নিরাপত্তা (কমপক্ষে স্বাস্থ্যসেবা, শিশুর যত্ন এবং বাসস্থানের অধিকার) থাকবে। এসইডব্লিউএ শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সেবা, যেমন ব্যাংকিং, স্বাস্থ্যসেবা, শিশুযত্ন, আইন সহায়তা, বিমা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, আবাসন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সুবিধা প্রদান করে।

দক্ষিণ আফ্রিকা The South African Basic Conditions of Employment Act ১৯৯৭ শিরোনামে একটি আইন প্রণয়ন করেছে, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শ্রমিকের জন্য চাকুরির মৌলিক শর্তসমূহ— নিয়োগপত্র, ওভারটাইম, ছুটি, যেকোনো বিষয়ে নোটিশ প্রদানের ন্যূনতম সময়সীমা, ছাঁটাই বা চাকুরিচ্যুতির সঠিক পদ্ধতি এবং পাওনা পরিশোধের বিধান মেনে চলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২০০২ সালের ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর ন্যূনতম মজুরি আইনের অধীনে গৃহশ্রমিক এবং বসতবাড়ির ব্যক্তিগত বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আইনের আওতায় এনেছে এবং বার্ষিক ৮ শতাংশ হারে মজুরি বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। একই সময়ে শহরাঞ্চলে পূর্ণকালীন প্রতি ঘণ্টায় কাজের ন্যূনতম মজুরি ZAR ৪.১০ (০.৪১০ ইউএস ডলার) এবং খণ্ডকালীন (সপ্তাহে ২৮ ঘণ্টার চেয়ে কম সময়ের কাজ) কাজের জন্য প্রতি ঘণ্টায় কাজের ন্যূনতম মজুরি ZAR ৪.৫১ (০.৪৫১ ইউএস ডলার) নির্ধারণ করা হয়। বেকারত্ব বিমা নিশ্চিত করার জন্য ২০০৩ সালে গৃহশ্রমিকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে পৃথক একটি আইন করা হয়। এই আইন প্রবর্তনের ফলে গৃহশ্রমিকদের মাসিক আয় ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পায় (Dinkelman Ges Ranchhod, ২০১০)। গৃহশ্রমিকদের মধ্যে যাঁরা সপ্তাহে ২৭ ঘণ্টার বেশি এবং ২৭ ঘণ্টার কম সময় কাজ করেন, তাঁরা যথাক্রমে ZAR ৮.৯৫ এবং ZAR ৭.৬৫ হারে প্রতি ঘণ্টায় মজুরি পেয়ে থাকেন (http://www.mywage.co.za/, জুন ২০১৪)।

এ ছাড়াও, চীন ও সিঙ্গাপুরে সরকার ভিন্ন ভিন্ন আইন এবং নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং জাতীয় উভয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণযোগ্য। (Shams, ২০১৩)।

১৯৯৭ সালের প্রথমার্ধে Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing-WIEGO প্রতিষ্ঠিত হয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারীদের সামাজিক সুরক্ষা দেয়া ও সংগঠিত করা, গৃহশ্রমিকদের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি এবং ঝুঁকি হ্রাসে বিশ্বায়নের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতি, হকার বা ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতাদের উন্নয়ন এবং সুরক্ষানীতিসহ সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের নীতিমালা প্রণয়নে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সম্পর্কিত পরিসংখ্যান ও তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে WIEGO-এর অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম।

হোমনেট দক্ষিণ এশিয়ার নারী গৃহকর্মীদের একটি নেটওয়ার্ক সংস্থা। এটি মূলত দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের গৃহশ্রমিক সংগঠনের মধ্যে সংহতি ও যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আঞ্চলিক পর্যায়ে গৃহশ্রমিকদের সংগঠিতকরণ, সফলতা এবং ব্যর্থতার দৃষ্টান্তসমূহ পরস্পরকে জানানো এবং গৃহশ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে আইন প্রণয়নের দাবিতে সরকারি পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি করার কাজ করে।

জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যমান উদ্যোগ ও কাঠামো শক্তিশালীকরণ

গৃহশ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক (ডিডব্লিউআরএন)

২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গৃহকর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'গৃহশ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক' নামে একটি নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়, যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন, মানবাধিকার সংস্থা এবং এনজিওসমূহ একত্রিত হয়ে গৃহশ্রমিকদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করে। বিল্‌স এই নেটওয়ার্কটির সচিবালয় হিসেবে কাজ করে।

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম (এসএনএফ)

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম সুশীল সমাজ, শ্রমিক সংগঠন, নারী অধিকার সংগঠন, পরিবেশ সুরক্ষা অধিকার সংগঠনসহ সার্বিকভাবে মানবাধিকার সংগঠনসমূহের একটি নেটওয়ার্ক বা ফোরাম, যা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্মস্থলে দুর্ঘটনা বা বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায়বিচার পাওয়ায় সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০০৫ সালের ১১ এপ্রিল ঢাকার সাভারের পলাশবাড়িতে একটি সোয়েটার নির্মাণ ভবন ধসে ৮৫ জন শ্রমিকের মৃত্যুর পর এই ফোরামটি গঠিত হয়। বর্তমানে বিল্‌স এই ফোরামের সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে।

চাতাল শ্রমিক সহায়তা কমিটি (চাসক)

২০০৭ সালে বিল্‌স সহযোগী জাতীয় ফেডারেশনভুক্ত আঞ্চলিক কমিটিসমূহের সমন্বয়ে ময়মনসিংহ ও দিনাজপুরে ৪৪ সদস্যবিশিষ্ট ২টি চাতাল শ্রমিক সহায়তা কমিটি গঠন করে। চাতাল শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি এবং জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে চাতাল শ্রমিকদের সংঘবদ্ধকরণ এবং অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে প্রধানত এই সংগঠনটি কাজ করছে। এটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রক্রিয়া এবং এই খাতে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরতা তুলে ধরা। কমিটির প্রধান ভূমিকা হলো আঞ্চলিক সহয়তা কমিটি গঠন, সুশীল সমাজের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় বজায় রাখা। এই কমিটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করা।

নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য বিমা প্রকল্প

সরকার নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য গোষ্ঠীবিমা চালু করেছে। পেশাগত কারণে কর্মস্থলে কোনো শ্রমিক গুরুতর আহত হলে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) এবং কোনো শ্রমিক কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত কারণে নিহত হলে নিহত শ্রমিকের পরিবার সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ পাবে। এই বিমা কর্মসূচির কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দূর করতে হবে। গণমাধ্যমের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা, শ্রমিকের আস্থা অর্জন, ট্রেড ইউনিয়নের যেসব সদস্য বিমার প্রিমিয়াম সংগ্রহ করবে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, নারী শ্রমিকদের প্রিমিয়াম হ্রাস ইত্যাদি পদক্ষেপ বিমার উদ্দেশ্য সফলকরণে সহায়ক ভূমিকা

রাখবে। নির্মাণখাতের পাশাপাশি অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতেও এই ধরনের বিমা উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা

সরকার

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের শ্রম আইনের আওতাভুক্ত করার জন্য সরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় আইএলও কনভেনশন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে শ্রম আইনের সংশোধন অত্যন্ত জরুরি ও সময়ের দাবি। নারী শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তাদের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং অন্যান্য বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রস্তুতকৃত খসড়া নীতিমালাসমূহ বিশ্লেষণসাপেক্ষে অনুমোদন করা সরকারের আরো একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক কাজ ।

নারী শ্রমিকদের নিপীড়ন, নির্যাতন, মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ ও কর্মপরিবেশ উন্নত করতে পৃথকভাবে পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা এবং যে সকল ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ বেশি, সে সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারভিত্তিতে দ্রুত পরিদর্শন ও পর্যক্ষেণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

ট্রেড ইউনিয়নকে জাতীয় উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে সংগঠিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কিশোর ও যুব নারী শ্রমিকদের শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করতে সরকারের বিশেষ প্রকল্প বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। নারী শ্রমিকদের শিশু-কিশোর সন্তানদেরও এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা যেতে পারে।

২০০৬ সালে প্রণীত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ আইন অনুযায়ী অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী এই অবহেলিত নারী শ্রমিকদের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

ট্রেড ইউনিয়ন

নারী শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন— বিষয় দুটিকে পৃথকভাবে বিবেচনা করার মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। মাতৃত্বকালীন সুবিধা, শিশুযত্ন, লিঙ্গভেদে মজুরি বৈষম্য এবং যৌন হয়রানির বিষয়গুলো শুধু নারী শ্রমিকের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত না করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মূল বিষয়ের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।

সভা ও অন্যান্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের সময় এবং স্থান এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিত, যাতে নারী শ্রমিকেরা নির্দিষ্ট সভা এবং কার্যক্রমে যোগদান করার যথেষ্ট সুযোগ পায়। সভা ও অন্যান্য কার্যক্রম চলাকালে শিশুযত্নের বিশেষ ব্যবস্থা ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ প্রভাবিত করতে পারে।

গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ

অনেক ট্রেড ইউনিয়নই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ওপর নির্ভরশীল এবং শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ দ্বারাই অধিকাংশ কার্যক্রম ও বিষয়বস্তু নির্ধারিত ও প্রভাবিত হয়। সে ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিক সদস্যরা কেবল দর্শক হয়ে যান। এতে নারী সদস্যদের অবস্থা আরো নাজুক হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ব্যক্তিনির্ভরতা কমানো ও অযাচিত প্রভাব নীতি ত্যাগ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত এবং মতামত এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ, স্বাধীনতা ও সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত। নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীদের নির্বাচিত করা ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকে অনুপ্রাণিত করবে।

নারী নেতৃত্বের উন্নয়ন

যে সকল কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে নারীদের কর্মপরিবেশের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে নারীরাই বেশি অবহিত। এ ধরনের কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে নারী শ্রমিকদেরই নির্বাচন করা উচিত। ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রম অধিকার সংগঠন এবং নারী অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলনে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে নারী কমিটি গঠন এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, যা নারী শ্রমিকদের অধিক আত্মবিশ্বাসী এবং নিজেদের সক্ষমতা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করবে।

নারী অধিকার বিষয়ে কর্মরত সংস্থা

নারী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার্থে নারী অধিকার সুরক্ষা বিষয়ে কর্মরত সংস্থাসমূহ বিভিন্নভাবে কাজ করে আসছে। বিদ্যমান কার্যক্রমসমূহকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে, বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায়, নিম্নোক্ত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে—

- নারী শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া;
- নারী কৃষিশ্রমিকদের টেকসই ও স্থায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করার উদ্যোগ গ্রহণ;
- জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস ও যোগ্যতা অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনা;
- বিভিন্ন ধরনের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি;
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংহতি স্থাপনের মাধ্যমে কাজ করা;
- বাংলাদেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক নারী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন সহায়ক নীতিমালা প্রণয়নে সম্মিলিত অ্যাডভোকেসি ও নীতিমালা বাস্তবায়নে সম্মিলিত পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ।

বৃহৎ পরিসরে নারী শ্রমিকের উন্নয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। কিছু খাত আইনগতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং প্রকৃতিগতভাবেও অপ্রাতিষ্ঠানিক শৈলীতে পরিচালিত হয়। দ্বৈত আচরণ এ সকল খাতের শ্রমিকদের অধিকার ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য নীতি নির্ধারণে বাধাস্বরূপ।

২. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের অধিকার ও ঝুঁকিমুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের বড়ো প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ও আইনগতভাবে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি না থাকা। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের মৌলিক শ্রম অধিকার ও শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য অতি দ্রুত শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩. বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে আনতে নতুন কৌশল গ্রহণের পাশাপাশি বিদ্যমান প্রচেষ্টাসমূহের সক্ষমতা ও প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. সরকারি নীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রমসমূহের (শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ, ইত্যাদি) মাধ্যমে নারী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মূলধারায় এনে তাদের দুরবস্থা ও অসহায়ত্ব দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫. এ ক্ষেত্রে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সময়ের দাবি। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শোভন কাজের প্রতিবন্ধকতা নিরসনের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্যোগ নিতে হবে। বৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠে সকল কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য সার্বিকভাবে শোভন কাজ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজের মৌলিক নীতিমালা ও অধিকার, যেমন বৃহৎ পরিসরে মানসম্মত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, জীবিকার নিশ্চয়তা, সামাজিক সুরক্ষা বিস্তৃতি ও সামাজিক আলোচনাকে ভিত্তি হিসেবে নিয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৬. জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কাঠামো প্রণয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মানসম্মত ন্যূনতম মজুরি কাঠামো গঠন ও সঠিক বাস্তবায়ন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসনে সহায়ক হবে।

৭. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। শিক্ষা, চিকিৎসা, শিশুযত্ন, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী শ্রমিকদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে খাতভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা চালু করা উচিত।

৮. নিয়োগকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন, নারী উন্নয়ন সংস্থা, শ্রমিক অধিকার সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নারী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মূলধারায় আনতে এবং তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধকতা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জন্য দায়ী কারণসমূহ চিহ্নিত করে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা উত্তরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ সহকারী নির্বাহী পরিচালক, বিলস। ssultanua@yahoo.com
মোঃ আওরঙ্গজেব আকন্দ গবেষণা সহযোগী, বিলস। aurongajeb@yahoo.com